দৈনিক সংবাদ

JUL 01 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...

চৌষট্টি হাজার মাদ্রাসা কারা শিক্ষার্থী, কি শিখছে?

আবু তাহের খান

মাদ্রাসা শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলাপ করতে গেলেই দেশের একটি স্বার্থান্বেষী মহল, যারা ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা ও তাকে পুঁজি করে রাজনীতি করেন, তারা রীতিমতো তেড়ে আসেন। বাস্তবে এরা আসলে ধর্মানুরাগী তো ননই- এমনকি মাদ্রাসা-শিক্ষার্থীদের শুভাকাঙ্ক্ষীও নন। বরং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বরাবরের মতো মূর্খতার বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখে তাদের নিজেদের ব্যবসা ও রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে এরা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করেন। এরা জোর গলায় মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে কথা বলেন; কিন্তু কেউই নিজের সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠান না। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যদি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরও সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সমপর্যায়ের সুবিধা লাভের অধিকারী বলে গণ্য করি, তাহলে সকলের আগে আমাদের কর্তব্য হবে দেশ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা উঠিয়ে দিয়ে ওই শিক্ষার্থীদেরও সেই একই ধরনের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া, যা সমাজের ক্ষমতাসীন সুবিধাভোগী শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা শিখছে। কিন্তু সে তো খুবই জানা কথা যে, নিজেদের কায়েমি স্বার্থে আঘাত লাগার ভয়ে সেটি এদেশের সুবিধাবাদী রাজনীতিকরা কখনই করবেন না।

রয়েছে। অন্যদিকে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ৬৫ হাজার। অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় সমান। সংখ্যাতাত্ত্বিক এ তুলনাটির ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ওই ৬৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্তত ৫০ শতাংশই স্থাপিত হয়েছে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ৬৬ বছরে (১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে) এবং বাকি ৫০ শতাংশ স্থাপিত হয়েছে স্বাধীনতা-পরবর্তী গত ৩১ বছরে। অন্যদিকে উল্লিখিত ওই ৬৪ হাজার মাদ্রাসার মাত্র ১০ শতাংশ স্থাপিত হয়েছে স্বাধীনতা-পূর্ব পাকিস্তানি আমলের ২৩ বছরে এবং বাকি ৯০ শতাংশ স্থাপিত হয়েছে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত সময়ে ২০ বছরে। তন্মধ্যে মওলানা মান্নান ধর্মমন্ত্রী থাকাকালেই স্থাপিত হয়েছে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মাদ্রাসা।

মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যকার উল্লিখিত তুলনার ক্ষেত্রে এর সংখ্যাগত দিকটি যেমন লক্ষণীয়, তেমনি এ সংখ্যা বৃদ্ধির সময়টিও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি- বেসরকারি নানা পর্যায়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে গত প্রায় এক শতাব্দীতেও যেখানে প্রতিটি গ্রামে গড়ে ন্যূনতম একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, সেখানে মাত্র ২০ বছরে প্রায় ৬০ হাজার মাদ্রাসা স্থাপিত হলো কেমন করে? কারা কি উদ্দেশ্যে রাতারাতি এত বিপুলসংখ্যক মাদ্রাসা গড়ে তুললো দেশে?

দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলার ব্যাপারে সরকারি প্রচেষ্টা ছাড়াও সামাজিকভাবেও দেশব্যাপী বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। যে কারণে প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যে, নিজ নিজ এলাকার জন্য দু'চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মঞ্জুরি বা বরাদ্দ লাভের আশায় বিভিন্ন মন্ত্রী ও সাংসদ শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে বিরামহীন তদবির করে বেড়ান। এমনকি কখনও কখনও বিষয়গুলো তারা জাতীয় সংসদের অধিবেশনে এবং মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায়ও উত্থাপন করে থাকেন। কিন্তু তারপরও সব সময় তারা যে কাঙ্ক্ষিত সংখ্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মঞ্জুরি বা বরাদ্দ সংগ্রহ করতে পারেন—বাস্তবে মোটেও তা নয়; বরং বহু ক্ষেত্রে তাদের হতাশই হতে হয়। কারণ দেশে যে পরিমাণে বা সংখ্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন বা চাহিদা রয়েছে, সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে তারচেয়ে অনেক কমসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মঞ্জুরি সরকার প্রদান করছে। মোট কথা, সম্পদের অভাবের কারণেই মূলত দেশে বর্ধিত সংখ্যায় নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠতে পারছে না।

সম্পদের অভাবের কারণে মন্ত্রী, সাংসদ ও অন্যদের শত তদবির সত্ত্বেও যেখানে দেশে প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠতে পারছে না, সেখানে একেবারে বিনা তদবিরেই মাত্র ২০ বছরে ৬০ হাজার মাদ্রাসা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান কিভাবে হলো? কারা কোন্ প্রক্রিয়ায় কিভাবে এ সম্পদ কোত্থেকে যুগিয়ে গেলো, তার হিসাব কি সরকারের কাছে আছে? আর এসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা কারা এবং কি তাদের উদ্দেশ্য, সে সম্পর্কে কোন তথ্যও কি সরকার দিতে পারবে বা এ সংক্রান্ত তথ্যাদি কি সরকার জনগণের কাছে প্রকাশ করবে?

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এসব মাদ্রাসায় কারা পড়াশোনা করছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষার কোন চাহিদা বাংলাদেশের বা অন্য কোন দেশের কর্মক্ষেত্রে প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে চরম বেকারত্বপীড়িত এদেশে অধিকাংশ মানুষ যেখানে আর্থিক টানাপড়েনের কারণে সামান্য কিছু আয়-রোজগারের আশায় তার শিশুসন্তানকে স্কুলে না পাঠিয়ে মাঠে, কারখানায় বা অন্যত্র পাঠান, সেখানে ওইসব মানুষের যদি নিজ সন্তানদের শিক্ষায়তনে পাঠানোর মতো সুযোগ হয়ই, তাহলে তারা অবশ্যই তাদের মাদ্রাসায় না পাঠিয়ে স্কুলেই পাঠাবেন। কারণ সেই একটাই, বাড়তি আয়-রোজগারের প্রত্যাশা। দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার কোন বাস্তব চাহিদা না থাকলেও এবং সেই একই কারণে এর জন্য কোন তয়-তদবির না থাকা সত্ত্বেও এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিপুলসংখ্যক মাদ্রাসা এখানে কিভাবে, কেন গড়ে উঠলো? কারা এর উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক? কি তাদের উদ্দেশ্য? বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করি।

উল্লিখিত মাদ্রাসাগুলোতে কারা পড়াশোনা করছে? খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এসব মাদ্রাসায় [illegible]

দরিদ্র পরিবারের সন্তান, এবং সেই দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের মধ্যেও, আবার যাদের ব্যাপারে অভিভাবকদের আশা-ভরসা তুলনামূলকভাবে কম, তাদেরই পাঠানো হচ্ছে মাদ্রাসায়। অর্থাৎ ওই মাদ্রাসাগামী ছাত্ররা আসলে দরিদ্রদের মধ্যেও আবার গুরুত্বের শ্রেণীবিন্যাসে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ও অবহেলিত। বিষয়টি তারা নিজেরাও বোঝেন ও উপলব্ধি করেন। ফলে এসব হতভাগ্য মাদ্রাসা শিক্ষার্থী যখনই কারো কাছ থেকে কোন বিশেষ গুরুত্ব পায় বা তাদের প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হয়, তখনই তারা কোনরূপ ভালমন্দ বিচার না করে (আসলে ভালমন্দ বিচারের কোন সুযোগই তাদের নেই) তৎক্ষণাৎ ওই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেমনটি তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তালেবান হওয়ার শপথ নিয়ে দেশে তালেবানি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। এরা বুঝতেও পারে না যে, স্বার্থান্বেষী মহল কিভাবে তাদের ব্যবহার করছে।

সার্বিকভাবেই বাংলাদেশে শিক্ষার মান এখন ব্যাপকভাবে পড়ে গেছে, বিশেষ করে গ্রামীণ স্কুল-কলেজগুলোতে। তার মধ্যে আবার মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার যে মান, বলতে অনেকটা রূঢ় শোনালেও এ ক্ষেত্রে বাস্তব সত্য হচ্ছে যে, সেটা আলোচনারও অযোগ্য। মাদ্রাসা শিক্ষার কোথাও কোন জবাবদিহিতার ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। আর যেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য চাকরি-বাকরি করার বিষয়টি খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয় (কারণ সরকারি-বেসরকারি খাতের কোন চাকরিদাতাই মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত কোন্ ব্যক্তিকে চাকরির জন্য যোগ্য হিসেবে গণ্য করেন না), সেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষার কোন পর্যায়ে কে কি শিখলো না শিখলো কিংবা আদৌ শিখলো কিনা, তা নিয়ে সমাজ বা রাষ্ট্র কারোরই কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। প্রচলিত ব্যবস্থায় তা থাকার যুক্তিও নেই। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। তথাকথিত ধর্মশিক্ষার নামে অধিকাংশ মাদ্রাসা ছাত্রই পরিণত হচ্ছে এক একজন বোধহীন কূপমণ্ডূকে। অবশ্য এ জন্য ওই শিক্ষার্থীরা দায়ী নয় মোটেও। দায়ী নন তাদের নিরক্ষর-দরিদ্র অভিভাবকরাও। কারণ এর কোন কিছুই তারা ভালভাবে জেনে বা বুঝেশুনে করছেন না। এক্ষেত্রে বস্তুতই তারা প্রচলিত রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অসহায় শিকার। ফলে মাদ্রাসা ছাত্রদের একটি বিরাট অংশ যে তালেবানি মানসিকতায় গড়ে উঠছে, তাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে না দেখে প্রয়োজন হচ্ছে তাদের জন্য সঠিকপথের নির্দেশনা; লাভের সুযোগ অবারিত করে দেয়া।

করে তারা বস্তুতই অত্যন্ত ভাগ্যবিড়ম্বিত। কারণ মাদ্রাসার ছাত্র হওয়ার ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কোন ভূমিকা না থাকলেও অনেকটাই তালেবানে (অবশ্য সবাই তালেবান নয়) পরিণত হওয়ার মতো নিকৃষ্ট ও পশ্চাৎমুখী কাজে জড়িত হওয়ার দায় শেষ পর্যন্ত তাদেরই বহন করতে হয়। দেশী-বিদেশী স্বার্থান্বেষী মহল অন্ধকারাচ্ছন্ন মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে এর শিক্ষার্থীদের একেবারেই অর্থহীন জীবনের পথে ঠেলে দিচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা সেখানে না পাচ্ছে প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা, না নিজেদের গড়ে তুলতে পারছে পার্থিব জীবনে ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে একেবারে সরাসরি মন্তব্য হচ্ছে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মাদ্রাসাগুলোতে বলতে গেলে কোন পড়াশোনাই হয় না। এখানে শিক্ষাদানের জন্য যেমন উপযুক্ত কোন শিক্ষক নেই, তেমনি এ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য তত্ত্বাবধানেরও কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে এই সুযোগে এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ শিক্ষক সেখানকার শিক্ষার্থীদের ধর্ম [illegible] শিক্ষা ও ব্যাখ্যা দিয়ে [illegible] তালেবানি জেহাদে [illegible] ফলে [illegible]

থাকে না।

আসলে ধর্মশিক্ষার ব্যাপারে এদেশের সাধারণ মানুষের কারোরই কোন আপত্তি নেই বা থাকার কথাও নয়। তবে আপত্তিটা হচ্ছে এই যে, ধর্মশিক্ষার নাম করে এসব মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর অধিকাংশই এক একজন ধর্মান্ধে পরিণত হচ্ছে, যাদের কাছে প্রতিপক্ষের পায়ের রগ কেটে ফেলা বা অন্যকে খুন করে ফেলাটা কোন ব্যাপারই নয়। তার সঙ্গে সাম্প্রতিককালে হরকাতুল জিহাদ, হরকাত-উল ইসলাম প্রভৃতি সন্ত্রাসী মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে ওঠার ফলে এরা এখন আর শুধু ধর্মান্ধতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং ধর্মান্ধতার সীমা ছাড়িয়ে এদের কেউ কেউ এখন এক একজন তালেবানি গোছের সন্ত্রাসীও হয়ে গেছে, যাদের অনেকের সঙ্গেই রয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের গোপন যোগাযোগ।

মাদ্রাসা শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলাপ করতে গেলেই দেশের একটি স্বার্থান্বেষী মহল, যারা ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা ও তাকে পুঁজি করে রাজনীতি করেন, তারা রীতিমতো তেড়ে আসেন। বাস্তবে এরা আসলে ধর্মানুরাগী তো ননই- এমনকি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শুভাকাঙ্ক্ষিও নন। বরং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বরাবরের মতো মূর্খতার বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখে তাদের নিজেদের ব্যবসা ও রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে এরা স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি করেন। এরা জোর গলায় মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে কথা বলেন; কিন্তু কেউই নিজের সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠান না। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যদি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরও সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সমপর্যায়ের সুবিধা লাভের অধিকারী বলে গণ্য করি, তাহলে সকলের আগে আমাদের কর্তব্য হবে দেশ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা উঠিয়ে দিয়ে ওই শিক্ষার্থীদেরও সেই একই ধরনের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া, যা সমাজের ক্ষমতাসীন সুবিধাভোগী শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা শিখছে। কিন্তু সে তো খুবই জানা কথা যে, নিজেদের কায়েমি স্বার্থে আঘাত লাগার ভয়ে সেটি এদেশের সুবিধাবাদী রাজনীতিকরা কখনই করবেন না।

অনেকে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের কথা বলেন, যা একেবারেই একটি ভ্রান্ত ধারণা। আসলে যা দরকার সেটি হচ্ছে দেশে একটি অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা, যার আওতায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কিন্ডারগার্টেন, বাংলা মিডিয়াম, ইংরেজি মিডিয়াম, সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার কোন সুযোগ থাকবে না। সে ক্ষেত্রে অষ্টম বা দশম শ্রেণী পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে দেশের সকল বিদ্যালয় কর্তৃক অভিন্ন পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এরপর শিক্ষার্থীরা যার যার পছন্দ, মেধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী [illegible] লাইন বেছে নিতে পারবেন [illegible] কারোরই কিছু বলার [illegible] পর্যায়ে ধর্মীয় [illegible] থাকবে [illegible]